Vol. 43 | No. 1 | 1999

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রমেশচন্দ্র সেনের ছোটগল্প : প্রান্ত-বদলের আকাঙ্ক্ষা

Volume	43
Issue	1
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Seraj Salekeen
Published online	October 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v43i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i1.5
Pages	69-77
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রমেশচন্দ্র সেনের ছোটগল্প : প্রান্ত-বদলের আকাঙ্ক্ষা

সিরাজুল ইসলাম*

রমেশচন্দ্র সেন (১৮৯৪-১৯৬২) একজন বিস্মৃতপ্রায় কথাসাহিত্যিক। প্রাচ্যমনস্তত্ত্বের[১] দক্ষ রূপশিল্পী রমেশচন্দ্র 'কল্লোল'-সমকালে সাহিত্যচর্চায় অগ্রসর হলেও চল্লিশের প্রগতিধারায় নিম্নবর্গীয় মানুষের পটচিত্রে তাঁর প্রধান অভিনিবেশ। 'পেশায় কবিরাজ নেশায় সাহিত্যিক' আমৃত্যু দারিদ্র্যের সঙ্গে বসবাস করেও সমাকালীন সকলপন্থার সাহিত্যকর্মীদের জন্য গড়ে তুলে ছিলেন 'সাহিত্য সেবক সমিতি' (১৯১১)। কিন্তু মৃত্যুপরবর্তীকালে এই সাহিত্যসেবীদের পক্ষ থেকে রমেশচন্দ্রকে স্মরণ করার কোনো তাগিদ অনুভূত হয় নি।[২] তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তর্মূলেও হয়তো নিহিত ছিলো বিস্মৃতির উৎস-সূত্র। সংঘমনস্ক রমেশচন্দ্র একান্তে ছিলেন আত্মমগ্ন ও নিরুদ্যোগী স্বভাবের। পূর্ববঙ্গীয় গ্রামীণ সারল্য ও কবিরাজসুলভ জনসংযোগপ্রীতি হয়তো তাঁকে সর্বাবয়বে সমকালীন আধুনিক মানুষে পরিণত করে নি! তবু তাঁর ব্যক্তি ও শিল্পীজীবন কৈতবধর্মী সংযোগহীন সমান্তরাল নয়, একাত্ম। অভিজ্ঞতা, অভিপ্রায় ও আবেগের তীব্র ভাষাপ্রকাশ তাঁর ছোটগল্প। ক্লাসিক সারল্য ও উজ্জীবনের মূর্ত আকাঙ্ক্ষায় মানবনিষ্ঠা তাঁর শিল্পীসত্তার প্রাণশক্তি। এই মানুষ সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রপরিত্যক্ত অপরমানুষ—ব্রাত্যজন।

[ক]

রমেশচন্দ্র সেনের মনোভূমিতে রোপিত হয়েছিল ধনতান্ত্রিক বিপর্যয়, মহাসমরউত্থিত অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা, ভূমিকেন্দ্রিক মানুষের রক্তক্ষয়ী তেভাগা আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের নারকীয় যন্ত্রণা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লোমহর্ষতা, দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে মনোবিচ্ছিন্নতার অগ্নিকুণ্ডে আবর্তিত আর্ত মানবতার হাহাকার। ধ্বস্ত-ধ্বান্ত পরিবেশে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন, ব্যক্তি রমেশচন্দ্রের দারিদ্র্য ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম-প্রচেষ্টার মধ্যে যেমন তা সুচিহ্নিত, তাঁর গল্পের বিস্তৃত মানবভূমিতে সেই চেতনারই চাষাবাদ। সংগ্রামী জীবনসাধনায় অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর যে প্রাণময় নিষ্ঠা তা প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতা এবং মানবসৃষ্ট শ্রেণীবৈষম্যের বৈপরীত্যে বিজয়ী ঘোষণার সচেতন প্রত্যয়ে রমেশচন্দ্র ইতিবাচক জীবনশিল্পী। প্রকৃতি অদৃশ্য নিয়তির মতো নিষ্ঠুর, আর সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য সমাজসৃষ্ট—এই বোধ স্পষ্ট কালচেতনার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিপাতে সমাজ বিজ্ঞানীর সুগভীর অনুধ্যানে লাভ করেছেন রমেশচন্দ্র।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

রমেশচন্দ্র বিরুদ্ধ পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ক্রূরতার মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে কেন্দ্রবিচ্যুত মানুষের জীবনসাধনার মর্মমূল উন্মোচনে সচেষ্ট। 'ডোমের চিতা' গল্পে হারু ও বদন সমাজপরিত্যক্ত, ব্রাত্য। বিশাল বিস্তৃত জলমগ্ন বিলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিপরীতে শুষ্ক প্রাণহীন মাদারের ভিটা যেন প্রকৃতির একটা অনিয়ম। নিয়ম-বহির্ভূত মানুষের জীবন—শ্মশানের ডোম হারু বদনের জীবন শ্মশানেরই প্রতিরূপক। কেবল বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের যমদূতের মতো জীবনকে বিশটি বছর এই নিঃসঙ্গ শ্মশানে টিকিয়ে রেখেছে। সমাজ-সংযোগহীন দুটি মানুষ দ্বীপের দূরত্বে মড়া পুড়িয়ে, কাঠ বেচে, মাছ ধরে, মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত চাল-ডাল-ফল সিদ্ধ করে উদরান্নের ব্যবস্থা করেছে। মৃত মানুষ তাদের পেশা ও অস্তিত্ব সহায়ক অংশ, তাই মৃত্যুই তাদের কাঙ্ক্ষিত, মৃত্যু সংবাদই তাদের প্রাণস্পন্দন। জীবনের ক্রূর রূপটি স্পষ্ট হয় অস্তিত্ব সংকটে, তাই বৃষ্টি প্লাবিত দিনগুলোতে হাড়িতে চাল না থাকলে হারু বদন শূকরের মতো কণ্ঠস্বরে মানুষের মৃত্যু কামনা করে। মড়া পোড়ানোর প্রাপ্য আদায়ে তারা সমাজিক নীতি চালিত নয়, সংকটউত্থিত অস্তিত্ব ভাবনাই তাদের চালিকা শক্তি। অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাই মানবীয় সংগ্রামের অন্যতম অংশ। বিশ বৎসরের নিত্যসঙ্গী হারু চাল–ডাল ক্রয় করতে গিয়ে সর্পদংশনে মৃত্যুবরণ করলে বদন তার সৎকারের ব্যবস্থা করে। অবশ্য হারুর নৌকায় রক্ষিত খাদ্য দ্রব্যগুলো তুলে নিতে ভুল করে না। সঙ্গীর মৃত্যু বদনের জীবনকে স্তব্ধ করে দেয় নি, বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে দৃঢ় বদন হারুর চিতার আগুনেই শুরু করে রান্নার কাজ।

> চিতার দিকে চাহিয়া চাহিযা বদন আপনা আপনি বলিয়া উঠিল, দূর ছাই, কিছু ভালো লাগে না। আগুনটা আবার নিবে যাবে। এর উপরই চাল চড়িয়ে দি।

মৃত্যুকে অস্বীকার না-করেও এ হচ্ছে জীবনের জয়বার্তা। জীবন প্রবহমান, অস্তিত্বের নিজস্ব প্রেরণায় সে সম্মুখবর্তী হবেই। নীতিনির্ধারিত মানবীয় সম্পর্কে নয়, প্রাণশক্তির অন্তর্ধর্মেই জীবন স্বতঃবিকশিত। বন্ধুর চিতায় ভাত মাছ রান্না হওয়ার চিত্রে জীবনের অনিবার্য চঞ্চলতা, ক্রূরতা নয় নিশ্চয়ই। হারু বদনের সমাজপরিত্যক্ত জীবনসাধনার সূত্রগুলো নির্ধারণ করে দেয় পরিস্থিতির স্বাভাবিকতা। তবু শুদ্ধতম অস্তিত্বভাবনা আত্মিক সম্পর্কস্থাপনে আবেগদীপ্ত, দায়িত্বে-কর্তব্যে মহৎ। জীবনের লাল রঙে মাদারের ভিটা রঞ্জিত হলেও হারুর চিতার দিকে চেয়ে বদনের অশ্রুমোচন সর্বমানবের দায়বোধে জাগ্রত হওয়ার ইঙ্গিতবহ।

মানুষ নিঃসঙ্গ অস্তিত্বসাধনায় তৃপ্তি পায় না, তাই মানুষের সংগ্রামী মনস্তত্ত্ব দায়িত্ব কর্তব্য ও মানবীয় একাত্মতা অনুভবের মধ্যে আত্মস্থ হয় শেষ পর্যন্ত। মানুষের বিভেদ সামাজিক নীতি নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু বিশুদ্ধ অস্তিত্বের মর্মমূলে সক্রিয় থাকে আত্ম-অতিক্রমের দুর্নিবার প্রচেষ্টা। 'মৃত ও অমৃত', 'তারা তিনজন' গল্পে 'ডোমের চিতা'গল্পের মতো নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও মৃত্যুর অন্ধকার অপচ্ছায়া বিস্তৃত হলেও শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষা প্রবল। 'মৃত ও অমৃত' গল্পে প্রকৃতি নিয়তির মতো নিস্পৃহ ও অনিবার্য। মৃত যুবক পুত্র বাঁকা-কে নৌকায় নিয়ে চলেছে পিতা বলাই। বিরুদ্ধ পরিবেশ বিষণ্ন-বিপর্যস্ত পিতার অন্তর্জগতের রূপকার্থ বহন করেও ইতিবাচক জীবনবোধ গল্পের মীমংসাসত্য। ছোট্ট নৌকা নদীর ঘূর্নীস্রোতে ভেসে যাওয়ার মুহূর্তে বলাই অপরিচিত ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে। মানুষের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য বোধে জাগ্রত বলাই জীবিতের পক্ষেই অবস্থান নেয় :

ছোট ডিঙিতে তিনজনের স্থান হওয়া অসম্ভব। উপরের দাঁতের পাটি দিয়া নীচের ঠোঁট চাপিয়া বলাই কি যেন ভাবে। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়। কিন্তু ভাবিবার ও ত' বেশী সময় নাই। জীবিত ও মৃতের মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে হইবে। মা তারা, মা—বলিয়া মৃতপুত্রকে নদীতে ফেলিয়া দিয়া অপরিচিত মানুষটাকে সে নৌকায় তুলিয়া লইল।

জীবন এক ঘূর্ণাবর্ত, নদীও গতিময় জীবনের প্রতীক—বলাই প্রকৃতিধর্মে উজ্জীবিত হয়েই মানবিক। নদীতে ঢেউ-এর পর ঢেউ, যেন অসীম সময় স্রোত—সেই অনন্ত ঢেউ-এর দোলায় হারিয়ে যায় বাঁকা। মৃত্যুকে পশ্চাতে ফেলে গতিময় জীবনসান্নিধ্যে ফিরে এলো বলাই। নিরাবেগ দার্শনিকতা জৈবধর্মের প্রাণস্পর্শে শিল্পিত হয়ে ওঠে :

একটু পরে যুবকটি দলিল, তুমি ফেলে দিয়েছ কাকে ?

বলাই উত্তর করিল, আমার বাঁকাকে। বুঝলে না, আমার ছেলে বাঁকা। সে মরে গিছল।

তারপরে আপন মনেই যেন আওড়াতে লাগিল, ছোট ডিঙি, তিনজনের এতে ঠাঁই হত না।

'তারা তিন জন' গল্পেও বিরুদ্ধ-প্রকৃতির বিপরীতে সংগ্রামী জীবন প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সমুদ্রে দিকভ্রষ্ট হয়ে সুপেয় জলের অভাবে আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখী কানাই, বিষ্টু ও যাদবের অস্তিত্ব সংকট, জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং মানবিক বোধে স্থিত হওয়ার দার্শনিক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে গল্পটি অনন্য। অনন্ত অবারিত জলরাশি আর নিঃসীম নীল আকাশ ভীতিকর মৃত্যুচেতনার জন্ম দিলেও অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা পিছিয়ে যায় নি। মৃত কানাইকে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় উজ্জীবনসূত্র :

শেষ রাত্রে বিষ্টু যাদবকে ডাকিয়া তুলিল, ওঠ যাদব, আমার পেটটা যেন কেমন—

এ্যাঁ! কস্ কি — বলিয়াই যাদব উঠিয়া বসিল। সে বলিব, আয় ঐ মড়াটারে আগে ফেলিয়া দি। অর ইচ্ছা আমাগোও সঙ্গে নেয়।

বিষ্টু ও যাদবের বংশপরম্পরার বিবাদ এই অস্তিত্ব সংকটের মুহূর্তে অকারণ বোধে মীমাংসিত হয়েছে, একে অন্যের সান্নিধ্যের জন্য অনুভব করেছে ঐকান্তিক আগ্রহ।

তিনটি গল্পেই মৃত্যুভীতি সক্রিয়। তবু কোথাও মৃত্যুকে বহন করা হয় নি, সর্বদাই মৃত্যুকে পরিত্যাগ করে জীবিতের সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে গল্পের দার্শনিক মীমাংসা উচ্চারিত হয়েছে। 'ডোমের চিতা' গল্পে বদন হারুর চিতার আগুনেই রান্না শুরু করেছে, 'মৃত ও অমৃত' গল্পে মৃত পুত্রকে নিক্ষেপ করা হয়েছে সমুদ্রে এবং ধ্বনিত হয় স্বপ্নময় জীবনাকাঙ্ক্ষা :

তন্দ্রার ঘোরে সে দেখে একটি পরী আসিয়া তাকে আকাশে উড়াইয়া লইয়া যায়। একটি মস্ত বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাকে খাইতে দেয় এক কলসী জল।

তিনটি গল্পেই মানুষের সঙ্গ লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিটি চরিত্র চঞ্চল। হারুর অনুপস্থিতিতে বদনের আর্তচিৎকার, বেঁচে থাকার প্রেরণায় কানাই বিষ্টু ও যাদবের চিৎকারের সঙ্গে বিলের নিঃসঙ্গতায় অসুস্থ পুত্রকে নিয়ে বলাই-এর মানব-সন্ধানী চিৎকারের ঐক্য লক্ষণীয়। অস্তিত্ব ভাবনার নিঃসঙ্গতা প্রতিটি চরিত্রকে ঠেলে দিয়েছে অনন্য সংকটে। তবু জীবন গতিময়, প্রতিটি মৃত্যুর জন্যে বেদনা অনুভূত

হলেও প্রকৃতির অসীমতায় হারিয়ে যায় মৃত, জীবনের পথেই শেষ সত্য দৃশ্যমান। জীবন কেবল বর্তমানে স্থিত নয়, তা ভবিষ্যৎ প্রসারী। সকল আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির পূর্ণতায় অপরের মধ্য দিয়ে তা বিকশিত হতে পারে। 'মৃত ও অমৃত' গল্পে বাঁকা পিঠা খেতে চেয়েছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে এই সাধ পূরণের দায়িত্ব দেয় পিতাকে : '... বড় পিঠে খেতে ইচ্ছে কচ্ছে। কিন্তু আমি আর খেতে পারব না, আমার হয়ে তুমি খেও বাবা, দুধ আর খেজুর গুড়ের চুষি।' যে জীবিত লোকটিকে নৌকায় তোলা হয়েছে তার ভেতরেও প্রবাহিত করে দেয়া হয় বাঁকার আকাঙ্ক্ষাটি : 'বলাই বলিল, দু'জনকেই দুধ আর চুষি পিঠে খেতে হবে। খেজুর গুড় আর দুধের চুষি।' জীবনের প্রবহমানতার এই সূত্রটি ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে 'তারা তিনজন' গল্পে :

> মৃত্যুর ঘন্টা দুই আগে সে [কানাই] যাদবকে বলে, লাল ঘোড়াটা দিস্ আমার বড় ছাওয়ালরে, ছোটরে চীনা মাটির পুতুলটা। আর বৌরে কইস্ বাগের হাটের রঙিন শাড়ীখানা পরতে—বলিয়াই সে একটু হাসিল।
>
> তারপর কহিল, আমি মললে পরে ও যেন একদিন রাত্তিরে গোপনে শাড়ীখানা পরে।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে মানুষেরই অনিবার্য বিজয়। অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার মৌল প্রবৃত্তি মানুষকে নিয়োজিত রেখেছে প্রকৃতির অজানা সূত্র আবিষ্কারে এবং নব নব সভ্যতার ভিত্তিস্থাপনে। কিন্তু বৈষম্যপূর্ণ মানবসম্পর্ক প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দুর্বল করে দেয়। পূর্ব-আলোচিত তিনটি গল্পে অর্থনৈতিক শ্রেণীর ঐক্য সূত্রে জীবনের যে বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়, কেবল শ্রেণীবৈষম্যর পরিণামে 'দু'ধারা' গল্পে অপচয়িত মানবজীবনের ভিন্নমাত্রা উদ্‌ঘাটিত। এ-গল্পটিতেও একটি বিরুদ্ধ পরিবেশে দু'জন মানুষ একে অন্যের সান্নিধ্যে উজ্জীবিত হতে চায় কিন্তু শ্রেণীপরিচয় তাদের শুদ্ধ অস্তিত্ব-লগ্ন হওয়ার প্রধান অন্তরায়। মানুষের প্রতি মানুষের যে মহান দায়িত্ব কর্তব্যবোধ তাতে জাগ্রত হতে ব্যর্থ হওয়ায় সুস্থ জীবনরূপ ধরা দেয় না। জীবন যেখানে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিবেচ্য সেখানে মুক্তি নেই, তা কেবল মানবতার অপমান। বৃদ্ধ রামদাস দুস্থ বিনয়ের দেহের উত্তাপ ও শ্বাস-প্রশ্বাসে অস্তিত্বরক্ষা করেও জীবনসাধনায় একাত্ম হতে পারে না। ভূমিকম্প-পরবর্তী ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার পেয়ে রামদাস বিনয়কেই দুর্ঘটনার কার্যকারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নেয় এবং এর মাধ্যমেই বিভক্ত হয়ে যায় জীবনের সংঘচেতনা। সংকট ও সংকট-উত্তরকালে জীবনের ঐক্য বিনষ্ট হয়—মানুষই সৃষ্টি করে জীবনের এই অন্তর্ঘাত।

'এক ফালি জমি', 'প্রেত', 'হারানী', 'ভাত', 'ভিখারীর জন্ম', 'আপিসের কাপড়' প্রভৃতি গল্পে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবনযাপনের অসহায়তা চিত্রিত। নিম্নবর্গের বঞ্চিত মানুষ বিচিত্র শাসন-শোষণের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য রথচক্রে পিষ্ট হয়, তবু জীবনের রক্তবীজ মৃত্যুহীন। সামাজিক বৈষম্য এক শ্রেণীর মানুষকে দারিদ্র্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে দেয় কিন্তু সেই প্রান্তীয় অবস্থান থেকে ও জীবনের মুক্তধারা প্রবাহিত হয়—'ভাত' গল্পের মাধব-মালতীর সন্তান কামনার স্বাভাবিকতায় তা প্রকাশিত। সন্তান তাদের নিকট জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণারই অপর নাম। তবু দায়িত্বহীন আত্মপ্রতিষ্ঠার অস্বাভাবিকতা মৃত্যু ডেকে আনে, 'রাজার জন্মদিন' গল্পে স্বার্থপর আত্মনিষ্ঠা বন্ধু হত্যার প্রেরণা দেয় মাত্র। সামাজিক জীবনে দায়িত্বহীনতার সর্বগ্রাসী রূপ অঙ্কিত হয়েছে 'প্রেত' গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট মন্বন্তরের পটভূমিতে জীবনের বিপর্যয় এ–গল্পের বিষয়বস্তু। সমাজসচেতন গল্পকারের মনোজগতে স্পষ্ট ধরা পড়েছে মন্বন্তরের কার্যকারণ :

> প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া মানুষের এই দুর্দশা করিয়াছে। একদিকে ঝড়-ঝঞ্ঝা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি আর একদিকে মানুষের লোভ ও অত্যাচার, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা। বন্যায় ঘর বাড়ী জমিজমা সব ধুইয়া মুছিয়া গেল। লোভ চোরাবাজারের সৃষ্টি করিল ঘুষের টাকা শাসনযন্ত্রকে কলুষিত করিল। ধনবান চাহিল দুর্বলের রক্ত। শুধু উদয়ডাঙা নয়, কুমুদ গাছি, সোনাজলি, বসন্তগঞ্জ আশেপাশের সমস্ত গ্রামেরই এক অবস্থা।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দুর্বিপাক সৃষ্টি করে যুদ্ধ, মন্বন্তর, আর উন্মূলিত জীবনের রূঢ় বাস্তবতা। ভূমিকেন্দ্রিক মানুষের বিপন্নতা নাগরিক জীবনের ক্ষমতাকেন্দ্রে সামান্যই আলোড়ন তোলে। উদয়ডাঙ্গার চাষী ছিদাম ও তার স্ত্রী কদমের জীবন লঙ্গরখানার অপমানে মানবেতর পর্যায়ে পৌঁছানোর ইতিবৃত্ত। বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাই জীবনকে কঙ্কালে পরিণত করে :

> পথের উপর সারি সারি নরকঙ্কাল দাঁড়াইয়া, কারও হাতে মগ, কারও বা মাটির ভাড়। কোমরে একটু করিয়া ন্যাতা জড়ানো। চোখে মুখে বুদ্ধি কিংবা লজ্জা—মনুষ্যত্বের কোন চিহ্নই নাই। সমাজ এদের মানুষ বলিয়া স্বীকার করে না। নিজেরাও ভুলিয়া গিয়াছে যে একদিন তারা মানুষ ছিল।

ঔপনিবেশিক জীবনের পরাভবচেতনা ডকুমেন্টশন সুত্রে গল্পটিকে ভারাক্রান্ত করেছে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, মানুষের ভঙ্গুর জীবনমূলে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে। মানুষ হারিয়ে ফেলে মানবীয় বিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। চাষী ছিদাম হয়ে যায় অশততার প্রতিভূ। জীবন বিনষ্টির বিরাবেগ প্রেক্ষাপটে ছিদামের নিকট কদম পরিণত হয় প্রেত-এ। 'হারানী' গল্পে মন্বন্তর-পরবর্তী বাস্তবতায় আত্মজা অস্বীকারের মাধ্যমে জীবনযাপনে সামগ্রিক বিপর্যয়কে সুচিহ্নিত করা হয়েছে। দেড় বৎসর পূর্বে দুর্ভিক্ষের সময় স্বামী ও পুত্রের মৃত্যু এবং কন্যার হারিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করে গ্রামে ফিরেছিল বিন্দু, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা তাকে পুনর্বার কলকাতায় টেনে এনেছে। গৃহভৃত্যের হীনমন্য জীবনে স্বপ্ন-সন্তুষ্টি এনে দেয় গৃহকর্তার পালিতা কন্যার সঙ্গে বিন্দুর হারিয়ে যাওয়া কন্যার সাদৃশ্য-অনুভব। এতে অতৃপ্ত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও কেন্দ্রলগ্ন হওয়ার পরোক্ষ ইঙ্গিত ধ্বনিত হলেও কেন্দ্র পরিত্যক্ত হওয়াই বিন্দুর নিয়তি। বিন্দুর জীবন পিপাসা মঙ্গলময় সুস্থতায় স্বস্তি খোঁজে, তাই আপন কন্যার ভেতরে দেখতে চায় সৌন্দর্য ও শান্তির আত্মস্থতা। এই জীবনভাবনায় বিন্দু অসুস্থ দুর্বল কদাকার আপন সন্তানকে অস্বীকার করতেও বিব্রত হয় না। সর্বপ্লাবী 'না' জীবনের সুস্থতা হরণ করে নেয়, তারই ধারাবাহিকতায় উদ্বাস্তু জীবনের অসহায় পরিণাম উচ্চারিত হয়েছে 'আপিসের কাপড়'গল্পে। নিম্ন বিত্ত পরিবারে হেমনাথের বেকারত্বের গ্লানি আত্মহত্যার পথে মীমাংসা খুঁজে নেয়। পণ্যমূল্যে জীবনের অসারতাই গল্পটির দৃষ্টি আকর্ষণী কেন্দ্র :

> ভাইয়ের মৃত্যুতে লোকনাথের চোখের জল পড়েছিল বটে কিন্তু শোকের বেগ কমার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, হেম মরল ত মরল, আপিসের কাপড় খানা পড়ে মরল কেন?

দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলোতে মানবীয় সম্পর্ক অস্বীকার করার মাধ্যমে সুস্থ সাবলিল জীবনের প্রবহমানতাই অস্বীকৃত হয়েছে। মানুষ অলঙ্ঘনীয় নিয়তির বিরুদ্ধেও ব্যক্তিত্ববোধ ও মানবিকতা নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু যখন মানুষের আত্মিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায় তখন মানুষ পতিত

হয় সার্বিক নিরাশ্রয়তায়। 'দুধারা' গল্পে যেমন মানব অস্তিত্বের মর্মমূলে ক্ষত সৃষ্টি করে সমাজ সত্য, তারই ধারাক্রমে 'একফালি জমি'ও 'ভিখারীর জন্ম' গল্পে শ্রেণীবৈষম্যের অন্তঃস্রোত অন্ধনিয়তির ক্রূরতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। একগুচ্ছ ভিখারীর জীবনে দৈব বঞ্চনা মানবমহত্ত্বের বোধ ও আশা-স্বপ্নের সান্ত্বনাকে হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

রমেশচন্দ্র সেনের প্রধান আকর্ষণ প্রান্তিক মানুষের বৈচিত্রময় জীবন। অবশ্য মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশের অন্তর্মূলে যে গভীরতর অসঙ্গতি সক্রিয় থাকে তার রূপাঙ্কনেও রমেশচন্দ্র স্বাতন্ত্র্যধর্মী। 'জেন্টেলম্যান এণ্ড কোং', 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নাম্বার ফোর' প্রভৃতি গল্পে সমকালীন সমাজ-জীবনের বাস্তবতা তীব্র স্যাটায়ারের বিষয়বস্তু। 'জেন্টেলম্যান এন্ড কোং' গল্পে পকেট কর্তন শিল্প, গুরুবাদ কিংবা ব্ল্যাকমার্কেট তিনটি অনুষঙ্গকে একত্রে ব্যবহারের ব্যঞ্জনা অতুলনীয়। 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নাম্বার ফোর' গল্পে মধ্যবিত্তের আবিল পঙ্কিল সাংস্কৃতিক মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'কোষ্টাকী পাশা' গল্প অপরাধপ্রবণ মধ্যবিত্তের অন্তর্জগতের অশ্বস্তিকর রূপকচিত্র। সচেতন হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো মধ্যবিত্ত চরিত্রের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। 'কোষ্টাকী পাশা' গল্পে প্রেমাস্পদকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় হারীত সকলের অলক্ষে হত্যা করে একটি কুকুর। 'স্যুয়ার্ড ডিচ্' গল্পে অন্ধকারের বাসিন্দা বিনয় কর্তৃক বিড়াল হত্যার ঘটনা মানুষের ক্রূরতা ও মানসিক অসুস্থতার চিত্র হিসেবে বিবেচ্য। মধ্যবিত্তের জীবনভাবনায় বহির্বাস্তব বিচ্ছিন্নতা অন্যতম চেতনাসত্য; অন্তর্জগতের মগ্নতায় তারা একাকী এবং সেই সূত্রে কখনো ধর্ষকামী। অবশ্য অন্ধমনোজগতের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটেও রমেশচন্দ্র গল্পের জীবনকে বিন্যস্ত করেছেন। 'যৈবন' গল্পে বৃদ্ধ হীরালাল, যুবতী বিধবা সুভদ্রা ও হীরালালের যুবকপুত্র গনু এক অদ্ভুত ত্রিকোণ সম্পর্কে আবদ্ধ। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিবেচনায় নারীর যৌবন, এবং সামন্ত সম্পত্তির যোগসূত্র ও এই সম্পত্তিকেন্দ্রিক দুই বিষম শক্তির বিরোধ ; বৃদ্ধ হীরালালের সিন্দুকের উপর শক্ত হয়ে বসে থাকা সুভদ্রা—সমস্ত চিত্রটিই একটি প্রতীকে পর্যবসিত। 'কাশ্মিরী তুষ' গল্পে বিধবা বধূ প্রমীলার অসঙ্গত যৌনবোধ সামাজিক বহির্চাপে একক ও আত্মিক অনুভবের রূপ নেয়। যুবক ব্রাহ্মণকে তুষ দেওয়ার আনন্দ প্রমীলার সারাজীবনের স্বামীপ্রীতিকে ছাড়িয়ে যায়। স্বামীর পরিত্যক্ত তুষটি গায়ে জড়িয়েও ব্রাহ্মণ স্পর্শের আনন্দ অনুভব ভুলে যাওয়া সম্ভব হয় না তার পক্ষে।

সমাজবিজ্ঞানীর নিষ্ঠা নিয়ে রমেশচন্দ্র সেন বিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানবমনস্তত্ত্বের গতিপ্রকৃতি বিবেচনায় সচেষ্ট হয়েছেন। মানুষের অস্তিত্বভাবনা আত্মগত নয়; পারিবারিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনুষঙ্গে সম্পর্কিত। এই সত্য-সন্ধানে তৎপর হয়েই রমেশচন্দ্র ব্রাত্যজনের সপক্ষে একটি ইতিবাচক জীবনবোধ সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়েছেন। বৈষম্যের দেয়ালে মানুষের জীবসাধনার ঐক্য ব্যাহত হয় — এই সত্যে আশ্বস্ত থেকে তিনি 'সাদা ঘোড়া', গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভৎসতা চিত্রিত করেছেন। সাদা ঘোড়ার প্রতীকে মানবীয় সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষা সকল মানুষের, কিন্তু স্বার্থপর শাসকগোষ্ঠীর প্ররোচনা সেই শান্তি ও স্বস্তিকর জীবন অর্জনে প্রধান প্রতিবন্ধক। সংকটের ভেতর দিয়ে শুদ্ধ অস্তিত্বের জাগরণ এবং স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতার অগ্নিপরীক্ষায় 'অন্তর ও বাহির' ও 'রাজার জন্মদিন' গল্পে যে ব্যক্তিগত উজ্জীবন-অভিনিবেশ 'সাদা ঘোড়া' গল্পে তা সামাজিক মাত্রায় বিন্যস্ত। দায়িত্ব-কর্তব্যে জাগ্রত গোষ্ঠীর ভেতর থেকে উচ্চারিত হয়–'আমাদের সাদা ঘোড়ার সইসকে, আমাদের চাঁদের সইসকে

কেউ মারতে পারবে না' এবং এর মধ্য দিয়েই উচ্চরিত হয় সংকীর্ণ সম্প্রদায়-বন্ধন ছিন্ন করার ইঙ্গিত। 'ভবানী সিংহের ফিশারি' গল্পে অনৈক্যে বিপর্যস্ত নিম্নবর্গীয় মানুষ এবং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রূরতার চিত্র প্রকাশিত। অর্থ–সঞ্চালনের ধনতান্ত্রিক রীতি কেন্দ্রিভূত শোষণ ক্ষমতায় প্রকাশিত হয়। এ জন্যেই ভবানী সিংহের ফিশারির বাঁধ তৈরি করতে গিয়ে পঙ্গু শ্রীধর পরিণত হয় ভিক্ষুকে। গল্পে গ্রামীণ মধ্যস্বত্বভোগী ও উচ্চবর্গের গোপন ঐক্যের ঐতিহাসিক বাস্তবতা শিল্প-সাফল্যে উচ্চারিত। ভিক্ষুক শ্রীধরের কণ্ঠেও প্রকাশিত হয় শ্রমের ঐতিহাসিক তথ্য :

> একটি গাছতলায় বসে এক খঞ্জ ভিক্ষা করছিল। এখানেই ছিল গোমস্তার বিশ্রামের ঘর। মাছ দেখে খঞ্জ বলে উঠল, বাঃ খাসা মাছ তো। এক-একটা নিদেন পাঁচ সেরি, কালিয়া হবে বুঝি ? খাবেন রাজাবাবু, ভালো করে তেল ঘি দিয়ে খাবেন।
>
> ...
>
> ও আমার রুধিরে পুরুষ্ট জীব।'

রমেশচন্দ্র সেন ব্যক্তিগত ব্যর্থতা-বিপন্নতার উৎসমূলে সমাজশক্তির যে ঐতিহাসিক ভূমিকা তার স্বরূপ আবিষ্কারে সচেষ্ট। সময়ের গভীর থেকে তিনি তুলে এনেছেন সমবেত ও সামাজিক মানুষের কণ্ঠস্বর। বেঁচে থাকার স্বাভাবিক স্রোতে তারা গতিশীল, সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত। 'সাকির প্রথম রাত্রি' গল্পে বিড়ম্বিত যৌনকর্মীর অসহায়তা সহমর্মীর দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়েছে। 'কাজল' উপন্যাসে অস্তিত্বের সংগ্রামে উজ্জ্বল যৌনকর্মীর জীবন কোনো রোম্যান্টিক ভাবাবেগ তাড়িত না — হয়ে যেভাবে বাস্তবানুগ জীবনাদর্শে ক্লাসিকধর্মী হয়ে ওঠেছে তার সগোত্র পূর্বোক্ত গল্পটিও। মানুষের যৌথস্বর সন্ধান করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র ব্রাত্যজীবনের যথার্থ রূপকার। রেনেসাঁস-জাগ্রত মধ্যবিত্তের ব্যক্তিত্ববোধের নিঃসঙ্গতা ও আত্মরতি আকৃষ্ট করেনি তাঁকে। ডোম, ভিক্ষুক, প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, গৃহভৃত্য, পতিত যৌনকর্মী, অন্ত্যজ মুসলমান কোচোয়ান, চোর, পকেটমার প্রভৃতি তাঁর গল্পে জীবন পরিধি সৃষ্টি করেছে। এ-সব প্রান্তীয় মানুষ, আর লেখকের অভিজ্ঞতা-বলয় ও সচেতন সমমর্মিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইতিহাসচেতনা এবং সামগ্রিকভাবে গল্পকার হিসেবেও রমেশচন্দ্রসেন সমকালে সরে গেছেন ভিন্ন প্রান্তে। সমাজের প্রভাব বিস্তারকারী অংশ কর্তৃক পরিত্যক্ত মানুষের খণ্ড খণ্ড জীবন-প্রান্তগুলো সন্নিবেশিত হয়ে সৃষ্টি করেছে তাঁর গল্পের অপর জগৎ এবং গল্পের ভঙ্গিতেই প্রকাশিত হয়েছে প্রান্তীয় মানুষের কার্যকারণ-সূত্র, উচ্চারিত হয়েছে সেই জীবনের বন্ধ দরোজাগুলো খুলে দেওয়ার দাবি।

[খ]

রমেশচন্দ্র সেন 'কল্লোল'-সমকালে আবির্ভূত হয়েও তার চেতনায় আকৃষ্ট হননি। জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৮) ও প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) গল্পের জগতে যে নাগরিক ও যৌনজীবনের চিত্রাঙ্কনে সাফল্য লাভ করেছেন রমেশচন্দ্র সতর্কতার সঙ্গে তা এড়িয়ে গেছেন। জগদীশগুপ্তের অন্ধ নিয়তির দুর্বিপাক চেতনাগত ভাবেই রমেশচন্দ্র থেকে দূরবর্তী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)-এর গল্পে যে উদারমানবতাবাদ ও গ্রামজীবনের

চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সামাজিকভাবে যুক্ত হয়ে বাংলাগল্পের যে গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত, তারই উত্তরসুরি রমেশচন্দ্র সেন। 'কল্লোল' ও কল্লোলোত্তর বাংলা ছোট গল্পের উর্বরভূমিতে লালিত হয়েও তিনি চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের ভূমিকেন্দ্রিক মানবীয় দায়বদ্ধতায় বিকশিত হয়েছেন। এই উত্তরণ সমকালে যেমন তাঁকে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত করে নি, তেমনি মৃত্যু পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন থেকে গেছেন অনুদ্ঘাটিত, বিস্মৃত। তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে কংগ্রেসী মতবাদের ধারক[৩] হিসেবেও, বলা হয়েছে তাঁর প্রগতিশীল আদর্শের কথা[৪] এবং সমন্বয়বাদী সাহিত্যিক[৫] হিসেবেও তাঁকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র শিল্পের যান্ত্রিক বিবেচনাকে অঙ্গীকার করেন নি, মানবতাবাদী এই কথাশিল্পী সরল স্বাভাবিক সঙ্গতিতে জীবনের অন্তর্মূলে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। আরোপিত আদর্শের মানদণ্ডে মানুষকে বিবেচনা করা তিনি অশৈল্পিক মনে করেছেন। মানুষই তাঁর জীবনদর্শনকে চালিত করেছে।

> রমেশচন্দ্র সত্যিকারের প্রগতিশীল ; তিনি দর্শনের চশমা পড়ে জীবনকে দেখেন নি: জীবনজাত অভিজ্ঞতাকে দর্শনের আলোকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে দেখে শিল্পসম্মত ভাবে প্রকাশ করেছেন; এই জন্য তিনি আজও জীবন্ত, বিস্ময়ের উৎস।[৬]

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি জীবনকে সময় ও সমাজের ভয়াল প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। যুদ্ধোত্তর ভারতীয় জীবনের ভঙ্গুর মনস্তত্ত্বকে জীবনশক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের অমিয়বাণীতে উজ্জীবিত করার শৈল্পিক ইঙ্গিত তাঁর গল্পের মেরুদণ্ড। বেঁচে থাকার আশাকে তিনি চিরন্তন ধরে নিয়ে সংগ্রামী বাস্তবতায় একক অস্তিত্বের ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করতে আগ্রহী। এজন্যে একদিকে সমকলীন মানুষের বিপন্নতা এবং অপর প্রান্তে অস্তিত্বের দার্শনিকতা তাঁর গল্পে মানবজীবনকে পরীক্ষাগারে পরিণত করেছে। তিনি মানুষের দুর্ভোগ ও সংগ্রামকে অনুভব করেছেন এবং মানুষের প্রতিই তাঁর মমতা। যেহেতু পরিত্রাণের পথ নির্দেশ যান্ত্রিকভাবে উচ্চারিত হয় নি, তাই সমকালে প্রগতিশীল গোষ্ঠী কর্তৃক নিন্দিতও হয়েছেন।[৭]

রমেশচন্দ্র সেনের গল্প মধ্যবিত্তসুলভ আত্মপ্রসারের আবেগ থেকে ভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করেছে। সমকালীন বাংলাগল্পে যে ব্যক্তিবাদী উচ্চারণ তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক বাংলার সমাজবাস্তবতায় ভূমিকেন্দ্রিক মানুষের দূরত্ব বিশাল। জাগ্রত মানুষের ধারণা, যা ব্যক্তিত্ব অভিধায় বহুল প্রচারিত, তার সাক্ষাৎ এ-ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কারণেই পাওয়া যাবে না। এ–জন্যই রমেশচন্দ্রের গল্পে নায়ক নেই, কেবল একগুচ্ছ মানুষের সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের গল্পে ব্যক্তিবাদ প্রতিবাদসূত্রে প্রগতিশীলতার যে মানদণ্ড স্থির করে দেয় সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'কল্লোল' পর্যায়ে তার গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। রমেশচন্দ্র সেন ঔপনিবেশিক পর্যায়ের মানব-সংগঠনে লক্ষ করেছেন স্পষ্ট দ্বিখণ্ডিত রূপ। সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তি, যা শোষকের নামান্তর তাকে তিনি পটভূমিতে স্থাপন করে প্রান্তেবাসী অন্ধকারাচ্ছন্ন ব্রাত্যজনকে তুলে এনেছেন নবতর দার্শনিক প্রত্যয়ে। প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার আকুলতা সমকালীন সামাজিক–অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক রুদ্ধতা-অবদানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবন সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে সামগ্রিকতায় একাত্ম হয়ে ওঠতে চায়। ব্রাত্যজনের নির্বিকল্প সংগ্রামে তাই মর্বিডিটির স্থান নেই। রমেশচন্দ্র সেন ধনতান্ত্রিক

ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোর প্রান্তেবাসী মানুষের মূল সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন আত্মবিনষ্টির প্রতিরূপকে। সেজন্যে ব্যক্তিগত আত্মপ্রসার ও যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ তাঁর গল্পে নেই এবং এর মাধ্যমেই তিনি বাংলাগল্পে ভিন্ন স্বরের অনন্য স্রষ্টায় পরিণত হয়েছেন।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পরিধির বাইরে আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত ব্রাত্যজনের সপক্ষে ইতিবাচক এক দার্শনিক-বাস্তবতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে রমেশচন্দ্র সেন বাংলা ছোটগল্পে ভিন্ন একটি প্রান্ত উন্মোচন করেছেন। সময় ও সমাজের ঐতিহাসিক সত্যে একাত্ম থেকে প্রকৃতিবাদ ও বাস্তববাদের সংশ্লেষণে তিনি নিরপ্রেক্ষ এক জীবনদৃষ্টির সৃষ্টি করেছেন। এখানে একমাত্র মানুষ সত্য, কিন্তু সেই মানুষ দায়বদ্ধ বৃহত্তর কল্যাণ ভাবনায়। আত্মরক্ষা তার প্রধান দাবি, যেহেতু সে বিনষ্টির মুখোমুখী: কিন্তু পরিস্থিতির স্বাভাবিকতায় সে মহত্ত্বে উজ্জ্বল। এই মানবীয় বীজমন্ত্র তিনি সন্ধান করেছেন পরিত্যক্ত মানবসত্তায়; তার গল্পে উপেক্ষিত হয়েছে মধ্যবিত্ত, ঘৃণিত হয়েছে উচ্চবিত্ত। এই ব্রাত্যজীবনদর্শন সৃষ্টির মধ্যদিয়েই রমেশ চন্দ্র সেন ভিন্ন প্রান্তের গল্পকার।

তথ্যনির্দেশ

১. 'পাশ্চাত্য বাস্তবতা আত্মপ্রসারের সংকট সমস্যা থেকে আত্মরক্ষার সমস্যাকে আবিষ্কার করেছে, আর প্রাচ্য বাস্তবতার অভ্রান্ত দিশা হলো আত্মরক্ষার কঠিন সংগ্রাম থেকে আত্মবিস্তারের পর্বটি অন্বেষণ।' শৈবাল মিত্র, 'প্রাচ্য বাস্তবতা ও রমেশচন্দ্র সেনের গল্প' ; *এবং এই সময়*, সম্পাদক-অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪র্থ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭, কার্তিক-পৌষ ১৩৯৪; কলকাতা, পৃ. ১৬২

২. সাহিত্য সেবক সমিতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় আবুবকর সিদ্দিক লিখিত *রমেশচন্দ্র সেন* গ্রন্থে। প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, পৃ. ২১-২২

৩. শুদ্ধসত্ত্ব বসু, 'বিস্মৃত কথাসাহিত্যিক রমেশচন্দ্র প্রসঙ্গে'; *এবং এই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩

৪. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্যপ্রাণ রমেশ সেন', *এবং এই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৫. চিত্তরঞ্জন দেব, 'সাহিত্যাচার্য রমেশচন্দ্র', *এবং এই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃ.৩৫

৬. পবিত্র মুখোপাধ্যায়, 'প্রথাজীর্ণ উপন্যাস(?) নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ', *এবং এই সময়*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

৭. পবিত্র মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২